*১১ সেপ্টেম্বরের প্রথম বার্ষিকী চলে এলো। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ। আরেকটি যুদ্ধ আসন্ন। এই এক বছরে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের আর সব দেশ থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে... মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি বিশ্বকে ঠেলে দিচ্ছে অজানা গন্তব্যে...* লিখেছেন

**জহিরুল আলম**

## ১১ সেপ্টেম্বরের পর মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি

# আরেকটি যুদ্ধ

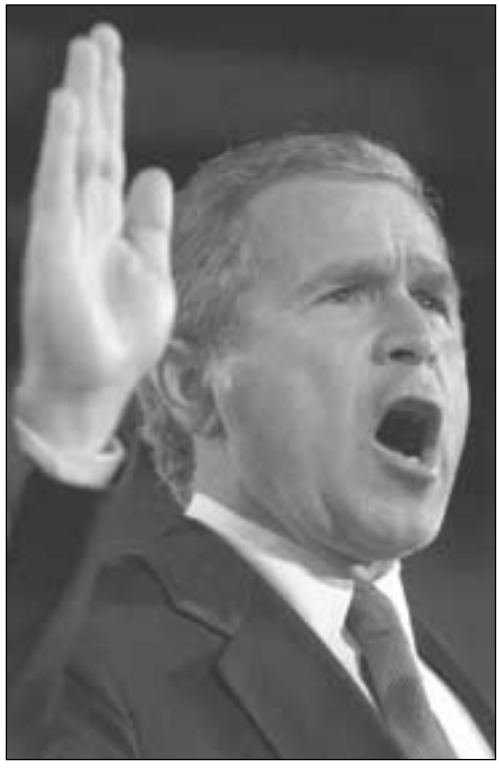

**১১ সেপ্টেম্বর ২০০১**

অবসর নেয়া বাস্কেটবল তারকা মাইকেল জর্ডান আবার কোর্টে ফিরে আসছেন কি-না সকালের খবরে ওয়াশিংটনসহ গোটা আমেরিকার মনোযোগ সেদিকে। এরপরই থমকে যাওয়া আরেকটি খবর। তোলপাড় সারা বিশ্ব। এ এক মহা ট্র্যাজেডির খবর। হাজার হাজার মানুষের জীবন প্রদীপ নিভে গেল মুহূর্তে। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী বিমান হামলায় ৮০ টিরও বেশি দেশের মানুষ প্রাণ হারায়। নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটন মিলিয়ে প্রায় তিন হাজার লোক মারা যায় এ হামলায়। দায়ী করা হয় সৌদি বংশোদ্ভূত আফগানিস্তানে প্রবাসী ওসামা বিন লাদেনের সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক আল কায়েদাকে। এরপর শুরু প্রতিশোধের পালা, যুদ্ধ ও ধ্বংস আফগানিস্তানে।

একবিংশ শতকে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র খোদ যুক্তরাষ্ট্রে ভয়াবহতম সন্ত্রাসী হামলা ইতিহাসের এক বেদনাময় অধ্যায়। ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে এক বছর। গোটা সময় ধরেই আমেরিকায় বজায় রয়েছে দুর্বার নিরাপত্তা ব্যবস্থা। হামলা চালানো হয়েছে আফগানিস্তানে। লাদেন ও তার আশ্রয়দাতা তালেবান শাসক উৎখাত হয়েছে। ধ্বংস করা হয়েছে সব আল কায়েদা ঘাঁটি। কিন্তু লাদেন আজও ধরাছোঁয়ার বাইরে। এমনকি তিনি কোথায় আছেন, আদৌ জীবিত আছেন কি-না তাও জানে না যুক্তরাষ্ট্র। এরই মাঝে পরিতৃপ্তির ঢেকুর তুলে যুক্তরাষ্ট্র আরেকটি যুদ্ধ , অর্থাৎ ইরাক আক্রমণের পরিকল্পনা

নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে।

কিন্তু আমেরিকার কোনো নাগরিককে যদি এখন প্রশ্ন করা হয়, ১১ সেপ্টেম্বরের আগে আপনার জীবন যেমন ছিল তার চেয়ে আজ মৌলিক কোনো পরিবর্তন এসেছে কি? এক বছরে আমূল বদলে গেছে কিছু ? নিশ্চয়ই উত্তর হবে, আশা তো ছিল সেরকমই, 'এক দিন সবকিছু বদলে যাবে'। কর্তৃপক্ষের এমন বাগাড়ম্বর সত্ত্বেও কিছুই বদলায়নি। বরং আজকের বিশ্ব আরেক আতঙ্কের মুখোমুখি। সুবিবেচনাপ্রসূত এবং ন্যায়সঙ্গত প্রতিশোধের প্রশ্ন এবং সেই সঙ্গে আরও বহু লোকের প্রাণহানির আতঙ্ক এখন বিশ্বের সবখানেই। কিন্তু সন্ত্রাসবাদকে ঘিরে এই যে আতঙ্ক, তার সূচনা কি ১১ সেপ্টেম্বর? সম্ভবত তা নয়। এর জন্ম একদিনে হয়নি। ১১ সেপ্টেম্বর এর পরিসমাপ্তিও নয়। পদ্ধতির দিক থেকে অভিনব ও ভয়াবহ হলেও, এই পরিণতি ষাটের দশক থেকে চলে আসা ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা মাত্র। বিংশ শতাব্দীর সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে প্রচলিত যুদ্ধ করে জয়ী হওয়া কঠিন কাজ, যদি না এই বিশ্ব থেকে ক্ষোভ, বৈষম্য ও হতাশা এবং দারিদ্র্যের মূলোৎপাটন করা যায়। আপাতত যা এক অসম্ভব কাজ। বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে সন্ত্রাসবাদ এক কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে অনেকের কাছে। সেজন্যই শুধু ইসলামী বলে নয়, এই হাতিয়ার বিশ্বব্যাপী সব জঙ্গীদেরই সমানভাবে আকৃষ্ট করে। সন্ত্রাসবাদ দমনের চেষ্টা যত শক্তিশালীই হোক না কেন, বিচ্ছিন্নভাবে এর কিছু প্রয়াস সফল হবেই। তবে সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক পরিচালনাকে আরও কঠিন করে তোলা সম্ভব।

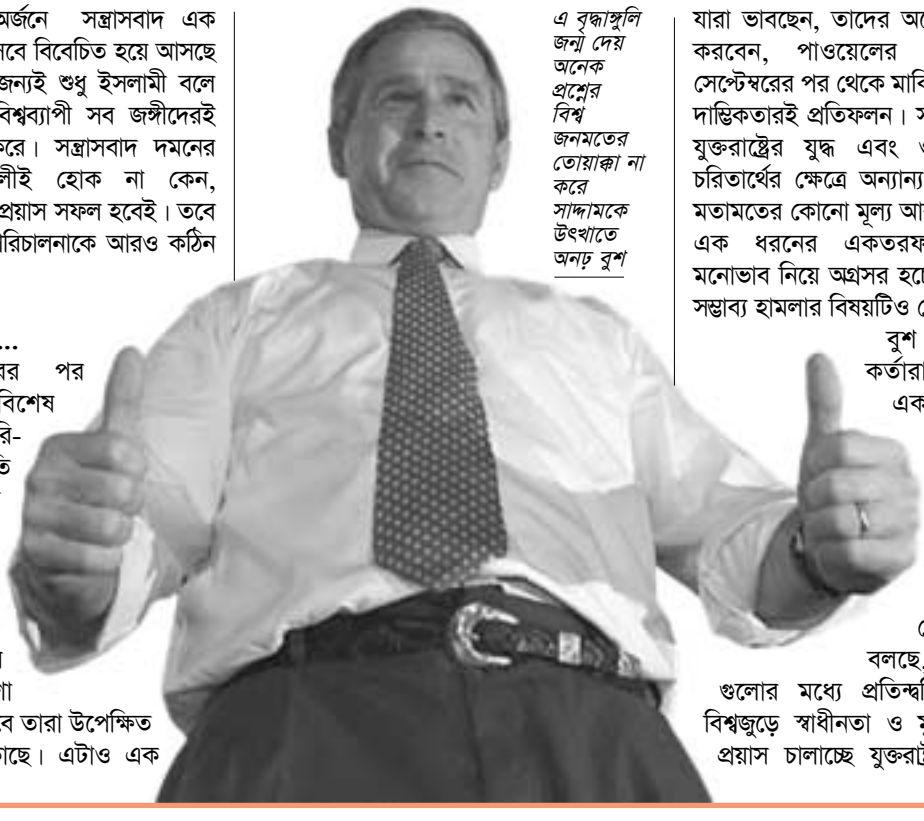



**দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছে...**

১১ সেপ্টেম্বরের পর যুক্তরাষ্ট্রের নীতি, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য ও পরিবেশ বিষয়ক নীতি ইউরোপীয় ও আরব মিত্রদের কাছ থেকে তাকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে। ল্যাটিন আমেরিকানরাও মনে করে অর্থনৈতিক দুর্দশা সত্ত্বেও ক্রমবর্ধমানভাবে তারা উপেক্ষিত হচ্ছে আমেরিকার কাছে। এটাও এক হতাশার কারণ। এশিয়ায় মার্কিন মিত্র জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া জানে না আমেরিকার কাছে তারা কতোটা গুরুত্ব বহন করে। আন্তর্জাতিক ইস্যুতে তাদের মতামতের আদৌ কোনো তাৎপর্য আছে কি-না। হালে চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কের কিছু উন্নতি হয়েছে। তবে ফের তা অস্বস্তিকর কালো মেঘে ঢেকে যাবার আভাস। সম্প্রতি ইরাকের সঙ্গে মস্কো বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করায় ওয়াশিংটন ক্ষুব্ধ হুঁশিয়ারি দিয়েছে। মস্কোর পাল্টা বিবৃতির মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে উত্তাপের আঁচ । আরব দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রের ইসরাইল প্রীতিতে গভীরভাবে হতাশ।

এ বছরের গোড়ার দিকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল রোমের বাইরে এক মার্কিন বিমান ঘাঁটিতে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। ব্যাখ্যা করছিলেন কিভাবে প্রেসিডেন্ট বুশ তাঁর পররাষ্ট্রনীতির বিষয়ে মিত্রদের সঙ্গে মতপার্থক্য নিরসনের চেষ্টা করছেন। পাওয়েলের মতে, বুশ মিত্রদের বোঝাতে চাইছেন, তাঁর অবস্থানটি কেন সঠিক। এখন মিত্রদের কাছে যদি তা মনঃপূত না হয়, তাহলে তিনি যা সঠিক মনে করবেন সে সিদ্ধান্তই নেবেন। পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে যারা ভাবছেন, তাদের অনেকেই এটা বিশ্বাস করবেন, পাওয়েলের এই বক্তব্য ১১ সেপ্টেম্বরের পর থেকে মার্কিন ফরেন পলিসিতে দাম্ভিকতারই প্রতিফলন। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ এবং ওয়াশিংটনের স্বার্থ চরিতার্থের ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের চাহিদা ও মতামতের কোনো মূল্য আর এখন থাকছে না। এক ধরনের একতরফা, আধিপত্যবাদী মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। ইরাকে সম্ভাব্য হামলার বিষয়টিও সেভাবেই এগোচ্ছে।



*এ বৃদ্ধাঙ্গুলি জন্ম দেয় অনেক প্রশ্নের বিশ্ব জনমতের তোয়াক্কা না করে সাদ্দামকে উৎখাতে অনড় বুশ*

বুশ প্রশাসনের কর্মকর্তারা সম্ভবত এমন একটি বিশ্বের স্বপ্ন দেখছেন যেখানে একটি মাত্র সুপারপাওয়ারের মনোযোগ ও অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করবে গোটা বিশ্ব। তারা বলছে, গ্রেট পাওয়ারগুলোর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নির্মূল এবং বিশ্বজুড়ে স্বাধীনতা ও মুক্তির সূচনা করার প্রয়াস চালাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন পররাষ্ট্র

দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারি অব স্টেট রিচার্ড আর্মিটেজ বলেন, বিশ্বের ইতিহাসে যেকোনো দেশের তুলনায় আমাদের প্রভাব, ক্ষমতা, মর্যাদা এবং শৌর্য বেশি। আর এটাই অন্যদের কাছে ঈর্ষার কারণ। যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন বা সেখানকার মানুষ যা ভাবেন, তার বাইরের মত হলো, আমেরিকা ক্রমশই গোটা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। আমেরিকানরা অবশ্য মানতে রাজি নয় এটা। বিশ্বের সঙ্গে এত বেশি অংশগ্রহণ অতীতে আর কখনই আমেরিকার ছিল না, উল্টো মত তাদের। এই যে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দুই চিন্তা ও যুক্তি, এর ভেতর দিয়ে এমন সত্যই ফুটে উঠছে যে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগনের ওপর সন্ত্রাসী হামলার ঘটনাটি আসলে বাকি বিশ্বের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল এক দূরত্ব রচনার ক্ষেত্রেই ভূমিকা রেখেছে।

১১ সেপ্টেম্বরের হামলার পর যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বজুড়ে সমর্থনের একটা সংক্ষিপ্ত ঢেউ বয়ে যেতে দেখা যায়। কিন্তু তার পর থেকে এই সমর্থনে ভাটা পড়তে শুরু করে। বোঝা যায় কারও সমর্থনই নিঃশর্ত নয়। বিশেষ করে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি ও কোয়ালিশনের প্রতি মার্কিন বৃদ্ধাঙ্গুলির মনোভাব, যেকোনো সমস্যাকেই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিকৃত এক ছকে বিচার এবং প্রশাসনের কর্মকর্তাদের ক্রমাগত ভুল, বিভ্রান্তিকর খবরের মাধ্যমে প্রায়ই এটা প্রতীয়মান হয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্র যেন নিজের সঙ্গেই নিজে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে বসে আছে। বিশ্বের আর সব দেশের কাছে যে সমস্যার গভীরতা অনেক ব্যাপক, যেমন গ্লোবাল ওয়ার্মিং, বিশ্বায়নের ঝুঁকি এবং সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার। সে ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের এক ধরনের স্বার্থবাদী নির্লিপ্ততা বিশ্ব বিবেককে সবসময়ই আহত করে। আমরা এখন এমন একটি বিশ্বে বাস করছি , যেখানে একটি মাত্র দেশ বিশ্বের তাবৎ ঘটনাবলীকে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধের' কৌশল ও দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করছে। সে হিসেবে আমরা এক জটিল সময়ই অতিক্রম করছি।

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ মার্কিন অগ্রাধিকারকে পরিবর্তন করেছে। কিছু দেশের সঙ্গে তার সম্পর্কের ধারাও বদলে দিয়েছে। চীন ও রাশিয়া আফগানিস্তানে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, তাদের কথিত মানবাধিকার রেকর্ড ও গণতন্ত্রবিরোধী আচরণের ব্যাপারে মার্কিন উচ্চবাচ্য বন্ধ হবে এ আশায়। বুশ প্রশাসন এখন চেচনিয়ায় রাশিয়ার মানবাধিকার লংঘন নিয়ে তেমন সোচ্চার নয়।

ইতিমধ্যে সোভিয়েট আমলের একতন্ত্রীদের শাসনপুষ্ট মধ্য এশিয়ার কিছু দেশের সঙ্গেও সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এমনকি ১৯৯৯ সালে সামিরক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা পাকিস্তানের জেনারেল পারভেজ মোশাররফের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছে তারা। বুশ প্রশাসনে একটা কথা চালু যে, বৃহত্তর আন্তর্জাতিক ইস্যুর বিনিময়ে হলেও তারা নিজস্ব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ করবে। তবে খোলামেলা এ কথা কখনই তারা স্বীকার করে না। বিশ্বের নানা স্বার্থ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অধিক মনোযোগের কারণেই এ কথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমন যুক্তি প্রশাসনের। বুশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা কন্ডোলিৎসা রাইস বলেন, আমরা সুদানের সংঘাত থেকে শুরু করে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে উত্তেজনা নিরসন, ফিলিপিন্সে সন্ত্রাসী দমন, অবাধ বাণিজ্য আলোচনা ইত্যাদি বিষয়ে নিজেদের জড়িত রাখার প্রয়োজন অনুভব করি।

*সাদ্দাম: বিশ্বের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি সিআইএ, এফবিআই- কেউই জানে না লাদেন কোথায়*

পর্যবেক্ষকদের মতে, এত ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র আসলে নিজের স্বার্থ নিয়েই এগোতে চায়, পরিণতি যাই হোক না কেন। ইরাকের বিরুদ্ধে তারা এখন একটি বৃহত্তর কোয়ালিশন গঠনের চেষ্টা করছে। সঙ্গে আছে ব্রিটেন। তবে তা আসলেই কতটা কার্যকর হবে এ মুহূর্তে বলা দুষ্কর। চীন, রাশিয়া, ফ্রান্স জার্মানি কেউই বিনা কারণে ইরাকে মার্কিন হামলাকে সমর্থন করে না। বুশ বলছেন, তিনি প্রমাণ দেবেন। ইরাককে জীবাণু অস্ত্রমুক্ত হওয়ার আলটিমেটাম দেবেন। তাতে কাজ না হলে একতরফাভাবেই হামলা চালাবেন তিনি। সেই মতো প্রস্তুতিও চলছে। প্রশাসনে ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনির মতো কট্টরপন্থীরা বলছেন, সময় যখন আসবে, তখন ঠিকই বিরোধী দেশগুলোও সমর্থন করবে, কারণটা যদি যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত হয়। সিদ্ধান্তটি যদি সঠিক হয় তবে তা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সর্বসম্মতির প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না মার্কিন প্রশাসন। কিন্তু এই সঠিকতার মাপকাঠি কি? কারা তা নির্ধারণ করবে? বুশ প্রশাসনের চোখে ইরাক দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র। কিন্তু আমেরিকায় এমন লোকও তো আছে যারা প্রশ্ন তুলেছে, কোনো স্বাধীন

সার্বভৌম একটি দেশের শাসন পরিবর্তনের দায়িত্ব বা অধিকার কে যুক্তরাষ্ট্রকে দিয়েছে? এই পৃথিবীকে নিরাপদ রাখার সোল এজেন্সি কি একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেরই? আর কি কারোরই এ ব্যাপারে কোনো বক্তব্য থাকবে না? এমনকি বিশ্বের সব রাষ্ট্রকে নিয়ে গঠিত সংগঠন জাতিসংঘেরও না!

**শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই**

মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিতে আধিপত্যবাদী অস্বচ্ছতা ও দ্বিমুখিতার পরিচয় অতীতে বহুবার মিলেছে। একটি মাত্র উদাহরণ টানা যায় মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে। বুশ ক্ষমতায় এসে প্রথমে সিদ্ধান্ত নিলেন, মধ্যপ্রাচ্যে তিনি নিজেকে জড়াবেন না। ইসরাইলি ও ফিলিস্তিনিরা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করবে এটাই সাফ জবাব বুশের। সহিংসতা যখন বাড়তে থাকলো, এ বছরের এপ্রিলে তিনি অধিকৃত আরব ভূখন্ড ছেড়ে দিতে ইসরাইলের ওপর চাপ দিলেন। জুনে এসে সেই নীতি বদলে তিনি ফিলিস্তিনি নেতা ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গে সব ধরনের যোগাযোগ ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত জানালেন। আরাফাতকে কোণঠাসা করার এই সিদ্ধান্ত আরব বিশ্বকে বিস্মিত করেছে। শান্তি প্রক্রিয়ায় কূটনৈতিক প্রয়াস থমকে যাওয়ায় ইউরোপীয় মিত্ররাও অবাক হয়েছে।

শুধু তাই নয়, আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র আরও অনেক বিষয়েই দ্বৈত নীতি অবলম্বন করে আসছে। তারা মানবাধিকারের কথা বলে, আবার আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ আদালত গঠনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর। বৈশ্বিক উষ্ণতা হ্রাসের লক্ষ্যে কিছু টার্গেট নিধারণ করে স্বাক্ষরিত একটি আন্তর্জাতিক চুক্তির বিরোধিতা করছে তারা। মার্কিন এসব অবস্থানের প্রতি বরাবর যারা সমর্থন দিয়ে আসছে, এখন সে রকম অনেক মিত্রের সঙ্গেই তার সম্পর্কের টানাপোড়ন চলছে। এমনকি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের লেবার পার্টিও ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ উন্মাদনার বিরুদ্ধে সোচ্চার। এমনকি ইরাক আক্রমণের প্রশ্নে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর, প্রতিরক্ষা দপ্তর, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল এবং ভাইস প্রেসিডেন্টের অফিসও স্পষ্ট বিভক্ত। সন্দেহ নেই, একবিংশ শতাব্দীতে সবচেয়ে বড় হুমকি সন্ত্রাসবাদ, সম্পদ বন্টনে বৈষম্য আর পরিবেশ বিপর্যয়। আমেরিকায় এখন ইরাক আক্রমণের ডামাডোল। বুশের প্রস্তুতিতে চূড়ান্ত আঘাত হানার লক্ষণ স্পষ্ট। এ নিয়ে অস্বস্তি গোটা বিশ্বে। মানবিক বিপর্যয়ের আরেকটি বড় দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে সম্ভাব্য এই মার্কিন একতরফা ভূমিকায় ক্ষুব্ধ না হওয়ার কোনো কারণ নেই।

# ১১ সেপ্টেম্বর এবং প্রসঙ্গ জার্মান নির্বাচন

লিখেছেন কোলন থেকে
**মিজানুর রহমান খান**

যুক্তরাষ্ট্রের ওপর জঙ্গি হামলার পর জার্মানির আত্মার মধ্যেই একটা ভয় যেনো খামচে ধরেছিলো। সাধারণ জার্মানদের ধারণা হয়েছিলো বিধ্বংসী এই আক্রমণ যুক্তরাষ্ট্রের ওপরই হয়নি, পরোক্ষভাবে জার্মানির ওপরও হয়েছে। তাদের চোখে-মুখে সেই আতঙ্কটা ছিলো অত্যন্ত স্পষ্ট এবং প্রকাশ্য। তার কারণ হয়তো এটাও যে, টুইন টাওয়ার এবং পেন্টাগনের ওপর যাত্রীবাহী বিমানকে ক্ষেপণাস্ত্র বানিয়ে হামলার পরিকল্পনা যারা করেছিলো তাদের এক নেতা নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা বিভাগকে ফাঁকি দিয়ে থেকে গেছে খোদ জার্মানিতেই, হামবুর্গ শহরে। তার ওপর আরো আশঙ্কা ছিলো, যুক্তরাষ্ট্রের পর সন্ত্রাসীদের পরবর্তী টার্গেট হয়তো হতে পারে

লন্ডন, প্যারিস অথবা বার্লিন। এই আতঙ্কের প্রেক্ষাপটে জার্মান রাজনৈতিক দলগুলোর কাছেও প্রধান এবং একমাত্র এজেন্ডা হয়ে উঠেছিলো আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস।

সেটা যেনো সত্যিই এক দুঃস্বপ্ন ছিলো।

সেই আলোচনা বা আতঙ্কের মাত্রা জার্মান সমাজ জীবনে এখন আর সেরকম তীব্র নেই। অনেকখানিই ম্লান হয়ে পড়েছে। প্রথমত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সরকারের সময়োচিত যথাযথ পদক্ষেপ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তড়িঘড়ি করেই নিরাপত্তা সংক্রান্ত বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে। কয়েক মাসের মধ্যেই খুব দ্রুত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তহবিল এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

তুমুল বিতর্কের ভেতরেও পরিবর্তন আনা হয়েছে বেশ কয়েকটি আইনে। জার্মান নাগরিকরাও সরকারের এসব ত্বরিত উদ্যোগে অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। পর্যবেক্ষকরা মন্তব্য করছেন, সেপ্টেম্বরের পর সমগ্র জার্মান জাতি বার্লিন প্রশাসনকে যেভাবে সমর্থন দিয়েছে, সংহতি প্রকাশ করেছে এবং তার প্রেক্ষাপটে সরকার এতো দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করেছে যে এই উদাহরণ জার্মানির ইতিহাসে অত্যন্ত বিরল। এ কারণে সরকার প্রশংসিতও হয়েছে। দ্বিতীয়ত জার্মানির নিজস্ব কিছু সমস্যা। বেকারত্বের বর্তমান পরিসংখ্যান সর্বকালের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। কর্মহীন মানুষের সংখ্যা এখন প্রায় ৪০ লাখ। তৃতীয়ত সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যা। জার্মানির পূর্বাঞ্চলে বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক ও প্রাচীন শহর বন্যায় বিধ্বস্ত। গত দেড়শ' বছরের ইতিহাসে এরকম ভয়াবহ প্লাবন জার্মানরা এর আগে আর কখনোই প্রত্যক্ষ করেনি। বন্যার ক্ষয়ক্ষতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের সঙ্গেই তুলনা করা হচ্ছে। এই আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রেক্ষাপটে সাধারণ নাগরিকরাও এখন লাগামগীন গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন এবং বায়ুমল উত্তপ্ত হয়ে ওঠার মতো পরিবেশ বিপর্যয়ের বিষয়ে আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি সচেতন হয়ে উঠেছে। চতুর্থত, আসন্ন সাধারণ নির্বাচন। আগামী ২২ তারিখে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

নির্বাচনের মাত্র সপ্তাহ দুয়েক আগে দেখা যাচ্ছে যে, ভোটারদের মন থেকে ১১ সেপ্টেম্বরের আতঙ্ক হঠাৎ করেই যেনো কোথায় মিলিয়ে গেছে। নির্বাচনী পোস্টারে এবং প্রচারণায় আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের প্রসঙ্গ নেই বললেই চলে। বরং সেখানে উঠে এসেছে ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের মতো অভ্যন্তরীণ সমস্যার কথা। সাধারণ নাগরিকরা, আরো খোলাখুলিভাবে বললে ভোটাররাই যখন ১১ সেপ্টেম্বরের অ্যাপোকেলিপ্স নিয়ে নির্বাচনের আগে তেমন একটা ভাবিত নন, নন উদ্বিগ্ন আতঙ্কিত। সে কারণেই রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী এজেন্ডা থেকে এই ইস্যুটি বিতাড়িত হয়েছে, অনেকটা সবার অলক্ষ্যেই। শিরোনাম হচ্ছে বেকামি, বন্যা, কর সংস্কার, অভিবাসন, ঝিমিয়ে পড়া অর্থনীতি। এসব দুঃসংবাদের নিচে চাপা পড়ে গেছে জার্মানির ভেতরেই গোকুলে বেড়ে ওঠা ইসলামী মৌলবাদ এবং সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কের অপতৎপরতা সম্পর্কিত উদ্বেগ।

'সর্বশেষ পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা যায়, জনপ্রিয়তার দৌড়ে সামান্য এগিয়ে আছেন বিরোধী নেতা এডমুন্ড স্টয়বার। সেই ব্যবধান কমছে ক্রমশ। এটা স্পষ্ট যে, নির্বাচনে লড়াই হবে হাড্ডাহাড্ডি'

এর কারণ হিসেবে রাজনীতিক বিশ্লেষকরা উল্লেখ করছেন, ১১ আর ২২ সেপ্টেম্বরের মধ্যবর্তী স্বল্প সময়, সন্ত্রাসী হামলার পরপরই চ্যান্সেলর গেয়ারহার্ড শ্রোয়েডার সরকারের জিরো টলারেন্স ইমেজ, সন্ত্রাসবিরোধী আইন পাসে সরকারের দ্রুত উদ্যোগ। এসবই সাধারণ জার্মানদের এই বলে আশ্বস্ত করেছে যে, তাদের দেশ নিরাপদ। চ্যান্সেলর শ্রোয়েডার যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবাদবিরোধী লড়াইয়ে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছেন। বলেছেন, সন্ত্রাসীদের প্রতি ন্যূনতম সহানুভূতি প্রদর্শন করা হবে না। সন্ত্রাসীদের কাছে জার্মানি কখনোই হবে না অভয় রাষ্ট্র। ফলে সাধারণ মানুষের মনে যে আতঙ্ক দানা বেঁধে উঠেছিলো, সেটা খুব দ্রুতই দূর হয়ে যায়। পর্যবেক্ষকদের মন্তব্য সরকার যদি বিষয়টিকে দক্ষতার সঙ্গে সামাল দিতে ব্যর্থ হতো তাহলে এই আতঙ্ক জার্মান সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিকে একেবারে স্থবির করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিলো।

শুধু সেটাই নয়, সন্ত্রাস নির্মূলে এবং প্রতিরোধে ক্ষমতাসীন সামাজিক গণতন্ত্রী দল এসপিডি এবং বিরোধী রক্ষণশীল সিডিইউ/সিএসইউ জোটের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যও ছিলো খুব কম। বিদায়ী চ্যান্সেলর শ্রোয়েডার এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী এডমুন্ড স্টয়বার উভয়েই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ছিলেন সমান কঠোর ও সমান সোচ্চার। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে যখন আফগানিস্তানে অভিযান শুরু হয় তখন দুই শিবিরের মনোভাব ছিলো যুদ্ধের পক্ষেই। যে কারণে জার্মান সেনাবাহিনী বুন্দেসভেরের সৈন্যদের কাবুলে পাঠাতে সরকারকে তেমন একটা বেগ পেতে হয়নি। আবার আফগানিস্তানের পর ওয়াশিংটন প্রশাসন যখন সামরিক হামলার মাধ্যমে ইরাকে ক্ষমতা পরিবর্তনের কথা বলছে তখন তার সমালোচনা এবং বিরোধীতায় সমান সোচ্চার ক্ষমতাসীন জোট সরকার এবং বিরোধী জোট।


## ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স

❑ জেনারেল ইংলিশ কোর্স : গৃহিণীদের জন্য। যোগ্যতা : কমপক্ষে এইচএসসি। যারা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ুয়া ছেলে মেয়ের সাথে এবং সময়ের সাথে চলতে চান। ৩ মাসের কোর্স।
**গ্রুপ সেশন, ৪ জন নিয়ে একটি সেশন।**
❑ বিজনেস ইংলিশ কোর্স : বয়স্ক, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ীদের জন্য যারা কমপক্ষে গ্র্যাজুয়েট এবং নিজ পেশায় ইংলিশকে কাজে লাগাতে চান। ৪ মাসের কোর্স। একজন নিয়ে একটি সেশন।
কোর্স টিচার : **জিয়া**
❑ বি.এ (অনার্স) এমএ (ঢাবি)
❑ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের অ্যাডভান্সড লেভেলে ইংল্যান্ডে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
ফোন : ০১৭-৫২৫৬৪৫ (টিএন্ডটি)

## ডিভি-ভিসা/বিদেশে ভর্তি/ইমিগ্রেশন পরামর্শ

আপনি জানেন কি, অন্য যে কোনো বছরের তুলনায় ২০০৪-এর দরখাস্তকারীদের ডিভি বিজয়ী হওয়া সহজ? সঠিক ছবি তোলাসহ ডিভির দরখাস্ত পূরণ করা হচ্ছে। ঢাকার বাইরের প্রার্থীরাও ডিভি ২০০৪-এর ফরম পূরণ করার জন্য ডাকযোগে পেতে হলে সার্টিফিকেট অনুযায়ী নাম, জন্ম তারিখসহ বায়োডাটা পাঠাতে হবে। ফরম পূরণ ফি ১০০/- (একশ' টাকা)। ডিভি ২০০৩ বিজয়ীদের ইন্টারভিউ-এর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুত করা হচ্ছে- অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়।
❑ নতুন নিয়মে Cook সহ বিভিন্ন পেশাতে যুক্তরাজ্য, কানাডাতে চাকরি, ইমিগ্রেশন, প্রসেস করা হচ্ছে। ❑ এ ছাড়াও IELTS করানো হচ্ছে।
**কাজী রকীবুল ইসলাম**, ব্রিটিশ কাউন্সিল ও এ.আই.ডি (আমেরিকান দূতাবাসের সাবেক কর্মকর্তা) ম্যানহাটন টাওয়ার (তৃতীয় তলা), প্রাইম ব্যাংকের উপরে, মালিবাগ মোড়, ঢাকা।
ফোন : ৯৩৩৮৭৮৩, ৯৩৩৮৯৭৭ বাসা : ৯৩৩৮৮৩৬, ৮৩১৪৪৯৮

জার্মান সরকারের পক্ষ থেকে বেশ স্পষ্ট করেই জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক অ্যাডভেঞ্চারে যোগ দেবে না জার্মানি। বলেছে, জাতিসংঘ অনুমোদন দিলেও বার্লিন প্রশাসন তাতে অংশ নেবে না। শ্রোয়েডার বলেছেন, এখনও মধ্যপ্রাচ্য সংকটের সমাধান হয়নি। তালেবানদের এখনও নির্মূল করা সম্ভব হয়নি। শেষ হয়নি আফগানিস্তান পুনর্গঠন প্রক্রিয়া। এরকম সময়ে ইরাক অভিযানের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

খ্রিস্টীয় গণতান্ত্রিক ইউনিয়ন সিডিইউ/ সিএসইউ জোট এবং ক্ষমতাসীন এসপিডি এখন প্রায় একই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করছে জার্মানির পররাষ্ট্র নীতি ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ইস্যুতে। অভিবাসন এবং পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোর যে দাবি রক্ষণশীল ইউনিয়ন করে আসছিলো সেই কথার প্রতিধ্বনি এখন পাওয়া যাচ্ছে ক্ষমতাসীন লাল-সবুজ জোট সরকারের মুখেই। উভয় শিবিরের নির্বাচনী ইশতেহারে যতোটা অমিল তার চেয়ে মিলের পরিমাণই চোখে পড়ার মতো।

দুই শিবিরের মধ্যে এখন যা নিয়ে নির্বাচনী বিরোধ চলছে সেটা সংকট কবলিত জার্মান অর্থনীতি। বর্তমান পরিস্থিতি ক্ষমতাসীন এসপিডির বিপক্ষে। বিরোধী জোটের এডমুন্ড স্টয়বার তার নির্বাচনী প্রচারণায় ভোটারদের সামনে প্রশ্ন রাখছেন আপনারা কি চান? কর্মসংস্থান, না বেড়ে চলা বেকারত্ব? অর্থনৈতিক শক্তি, না পেছনে পড়ে থাকা? প্রবৃদ্ধি না স্থিতাবস্থা? স্টয়বার বলেন, বাছাইয়ের সিদ্ধান্তটা খুব সহজ। অন্যদিকে, চ্যান্সেলর শ্রোয়েডার বলছেন, যে কোনো একটি বিকল্প বেছে নিতে হবে ভবিষ্যৎ অথবা অতীত, উন্নয়ন অথবা অনগ্রসরতা, সামাজিক ন্যায়ের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা জার্মানি অথবা নতুন মোড়কে অতীতের বাতিল হয়ে যাওয়া দাওয়াই।

শক্ত দুই প্রার্থী টেলিভিশনের পর্দায় বিতর্কে লিপ্ত হয়েছেন। জার্মানির ইতিহাসে এটাই প্রথম কোনো নির্বাচনী টিভি বিতর্ক। চার বছরের শাসনকালের প্রান্তে দাঁড়িয়ে বিদায়ী চ্যান্সেলর টেলিভিশনের পর্দার সামনে রক্ষণাত্মক ভূমিকাই নিয়েছেন। স্টয়বার তাকে একের পর এক আক্রমণ করে গেছেন।

সেসব প্রশ্নের শুধু জবাব দিয়ে গেছেন শ্রোয়েডার। শ্রোয়েডার ক্ষমতায় আসার আগে বেকার মানুষের সংখ্যা হ্রাসের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেটা পূরণে তার ব্যর্থতার কথাই বার বার মনে করিয়ে দিয়েছেন স্টয়বার। শ্রোয়েডার কর্মহীন মানুষের সংখ্যা তার মেয়াদকালে ৩৫ লাখে নামিয়ে আনার অঙ্গীকার করেছিলেন গত নির্বাচনের প্রচারণায়।

জার্মান অর্থনীতির একটা বড় অংশ মার্কিন অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত। বর্তমান স্থবির অর্থনীতির জন্য জোট সরকার যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির মন্দাভাবকেই দায়ী করছে। কিন্তু বিরোধী দল বলছে, শ্রম বাজার জার্মান অর্থনীতির ওপরেই নির্ভর করছে। ব্রিটেন, ফ্রান্স, সুইডেন, ফিনল্যান্ড এবং স্পেনেরও একই সম্পর্ক যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে। কিন্তু জার্মানিতে যে হারে বেকারত্ব বাড়ছে আর মুখথুবড়ে পড়ছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সেরকম হচ্ছে না সেসব দেশে। চ্যান্সেলরের যুক্তি- এটা বিশ্ব অর্থনীতির মন্দার ফল, জার্মানির নিজস্ব এবং একার কোনো সমস্যা নয়। তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে, এই পরিসংখ্যানে তিনি নিজেও কিছুটা হতাশ। তবে ব্যর্থতার পুরোপুরি দায়ভার নিতে রাজি নয় তার সরকার।

জার্মানিতে আরো বিদেশী আশ্রয় দেয়ার বিরুদ্ধে স্টয়বার। তার মতে, এটা সরকারের একটা ভুল সিদ্ধান্ত। প্রতি বছর জার্মানি পাঁচ থেকে ছয় লাখ নতুন অভিবাসীকে আশ্রয় দিচ্ছে। এর আকার ডর্টমুন্ড বা ন্যুর্মব্যার্গ শহরের জনসংখ্যার সমান। বিরোধীরা বলছে, নতুন অভিবাসন আইনের ফলে বছর প্রতি নবাগত বিদেশীর সংখ্যা আরো এক থেকে দেড় লাখ বৃদ্ধি পাবে। ইতিমধ্যেই যেসব বিদেশী এবং তাদের সন্তান জার্মানিতে বসবাস করছে তাদেরকে জার্মান সমাজে আত্তীকরণের প্রক্রিয়া এখনো শেষ হয়নি। তাদের জন্য আরো অনেক কিছু করার রয়েছে। সেক্ষেত্রে আরো বিদেশীকে আমন্ত্রণ জানানোর অর্থ কি হতে পারে!

গত মার্চ মাসে পাস হওয়া অভিবাসন আইনটির পক্ষে যুক্তি দেখাতে গিয়ে চ্যান্সেলর শ্রোয়েডার বলেছেন, তথ্যপ্রযুক্তির মতো যেসব খাতে দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন সেখানেই বিদেশীদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে যারা জার্মান অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

বিদায়ী জোট সরকার আগের সরকারের ১৬ বছরের জঞ্জাল পরিষ্কার করার কথা বলেছেন। বলেছেন সেসব করতেই অনেকটা সময় কেটে গেছে। আর সে কারণেই সব কাজ শেষ করা হয়ে ওঠেনি। রসিকতা করেই চ্যান্সেলর শ্রোয়েডার মন্তব্য করেছেন আমরা যদি সেসব কাজ সমাপ্ত করতে পারতাম তাহলে আবার দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফেরার কোনো প্রয়োজনই হতো না।

টিভি বিতর্কে কেউ সুস্পষ্টভাবে জিততে পারেননি। বিতর্ক আরো হবে। সর্বশেষ পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা যায়, জনপ্রিয়তার দৌড়ে সামান্য এগিয়ে আছেন বিরোধী নেতা এডমুন্ড স্টয়বার। সেই ব্যবধান কমছে ক্রমশ। এটা স্পষ্ট যে, নির্বাচনে লড়াই হবে হাড্ডাহাড্ডি। তবে জার্মানির ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব কার হাতে যাচ্ছে সেটা দেখার জন্যে ২২ তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে।